‘রাষ্ট্র মেরামতে’র লক্ষ্যে রাজনৈতিক সংস্কার

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৩ মে ২০১৯)

গত বছর নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময়ে আমাদের তরুণরা ‘রাষ্ট্র মেরামতের’ দাবি তুলেছিল। সাম্প্রতিক নির্বাচন ও পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, রাষ্ট্র মেরামতের বিষয়টি এখন সময়ের দাবি। প্রয়োজনীয় **আইনকানুন-নীতি কাঠামো-মূল্যবোধ** (laws, policies and values), **পদ্ধতি-প্রক্রিয়া** (process and systems) ও **প্রতিষ্ঠান** (institutions) একটি রাষ্ট্রের ‘গভার্নেন্স’ বা শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে শাসন কাঠামোর এসব অঙ্গ সক্রিয়তা অর্জন করে। তবে ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার হলে শাসন কাঠামো কার্যকর হয়, যা রাষ্ট্রে সুশাসন কায়েম করে। আর ক্ষমতার লাগামহীন ব্যবহার হলে – রাষ্ট্রে ‘চেকস অ্যান্ড বেলেন্স’ বা নজরদারিত্বের কাঠামো ভেঙে গেলে যা ঘটে – এসব অঙ্গগুলো কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে, রাষ্ট্রে অপশাসন কায়েম হয় এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের বিস্তার ঘটে। তাই রাষ্ট্র মেরামতের সূচনা হতে হবে শাসন কাঠামোকে কার্যকর করার মাধ্যমে, যার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় কতগুলো সুদূরপ্রসারী সংস্কার।

গত কয়েক মাসে **সুজন**–সুশাসনের জন্য নাগরিকের পক্ষ থেকে আমরা সারাদেশ এগারোটি কনসালটেশন বা আলোচনা সভার আয়োজন করেছি। এসব আলোচনা সভায় সুজনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাগরিকরাও উপস্থিত ছিলেন। এসব সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতে আমরা একগুচ্ছ সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করেছি। আজকের এ গোলটেবিল বৈঠকের উদ্দেশ্য হলো এসব সংস্কার প্রস্তাব সম্পর্কে আপনাদের মতামত গ্রহণ করা, যার ভিত্তিতে আমরা এগুলো চূড়ান্ত করব এবং পরবর্তীতে এগুলো সম্পর্কে জনমত সৃষ্টির উদ্যোগ নেব। প্রসঙ্গত, ২০০৪ সাল থেকেই সুজন রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয় নিয়ে কাজ করে আসছে।

আপনাদের অনেকেই অবগত আছেন যে, **সুজন** দেশের গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা একটি নির্দলীয় নাগরিক সংগঠন। ২০০২ সালে সংগঠনটি যাত্রা শুরু করে। আমরা মনে করি, মানব সেবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে রাজনীতি। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই দেশে অর্জিত হতে হবে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সুশাসন। আর এজন্য প্রয়োজন সুস্থ ধারার তথা আদর্শভিত্তিক ও জনকল্যাণমুখী রাজনীতি। এককালে এদেশে সুস্থ ধারার রাজনীতি চর্চা হলেও, বর্তমানে অনেকাংশেই তা অপরাজনীতি ও দুবৃর্ত্তায়নের শিকার। কিন্তু জনকল্যাণমূখী রাজনীতি ফিরিয়ে আনার জন্য রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের কোনো বিকল্প নেই, যার জন্যও প্রয়োজন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার।

সুজন-এর সংস্কার প্রস্তাবসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন: একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও সামাজিক ন্যায় বিচারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সৃষ্টি, যার স্বীকৃতি আমাদের সংবিধানে রয়েছে। এছাড়াও আমাদের মূল সংবিধানে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু সংবিধানের সেই অসাম্প্রদায়িক চরিত্র আমরা ধরে রাখতে পারিনি। প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ও ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ। তাই আমাদের রাজনীতিতে আজ জরুরি ভিত্তিতে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সুস্থ ধারার শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার রাজনীতি ফিরিয়ে আনা দরকার, ‘যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে’ (বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনা)। প্রতিষ্ঠা করা দরকার প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার পরিবর্তে অর্ন্তভুক্তিমূলক ও সহিষ্ণুতার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষিত ‘দিনবদলের সনদ’ শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তনের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করেছিল।

২। নির্বাচনী সংস্কার: নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সম্মতির শাসন তথা গণতান্ত্রিক শাসনের সূচনা হয়। তাই এ নির্বাচন হওয়া দরকার সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য। ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনটি ছিলো একতরফা ও বিতর্কিত। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কয়েকটি স্থানীয় সরকার ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে ব্যাপক কারচুপি ও মানুষের ভোটাধিকার অধিকার হরণের। উদাহরণস্বরূপ, ৫০টি সংসদীয় নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনামূলক গবেষণার প্রেক্ষিতে টিআইবি প্রশ্ন তুলেছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে। দাবি করেছে যে, ‘ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের অধীনে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কা’ ছিলো তা সঠিক প্রতীয়মান হয়েছে। তাই গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে আমাদের নির্বাচনকালীন সরকারকে নিরপেক্ষ হওয়া জরুরি। আর নির্বাচন ব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত ও পরিশুদ্ধ করতে এবং নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে আজ প্রয়োজন এর কতগুলো সংস্কার, যার জন্য আবশ্যক হবে আইন সংশোধন ও নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তন। সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে আজ আমাদের গভীরভাবে ভাববার সময় এসছে।

৩। কার্যকর জাতীয় সংসদ: জাতীয় সংসদকে একটি স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা দরকার, যাতে এটি রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণসহ নির্বাহী বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। সংসদকে কার্যকর করার জন্য অনেকগুলো বিষয় সম্পর্কে ভাবা দরকার। ভাবা দরকার সংসদের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে সংসদীয় কমিটিগুলোকে সক্রিয় ও কার্যকর করার বিষয়ে। কমিটির সদস্যদের যেন কোনোরূপ স্বার্থের দ্বন্দ্ব না থাকে তা নিশ্চিত করাও আবশ্যক। সংখ্যাগত দিক থেকে বিরোধীদের শক্তি যত সীমিতই হোক, তাদের গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া আবশ্যক। সংসদ সদস্যদের জন্য অনতিবিলম্বে **‘সংসদ সদস্য আচরণ আইন’** ও **‘সংসদ সদস্যদের অধিকার ও দায়মুক্তি আইন’** প্রণয়ন করা দরকার। বাৎসরিকভাবে তাঁদেরকে সম্পদের হিসাব দেয়া দরকার। দরকার সংসদভিত্তিক কার্যক্রমে নিবিষ্ট করার লক্ষ্যে তাঁদেরকে স্থানীয় সরকারে সংশ্লিষ্টতা থেকে বের করে আনা। সংসদ সদস্যদের আরও কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য ৭০ অনুচ্ছেদে পরিবর্তন আনা দরকার, যাতে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এবং জাতীয় বাজেট পাস ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যরা স্বাধীনভাবে আলোচনা-সমালোচনা করা-সহ নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দিতে পারে।

সংসদকে কার্যকর করার জন্য বিরোধী দলেরও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই সংসদ বর্জনের সংস্কৃতির অবসান ঘটানো দরকার। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচেনায় সংসদকে কার্যকর করার জন্য বিরোধী দলকে সাজানো বা নিয়ন্ত্রিত বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়ে প্রকৃত বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করা আবশ্যক, কারণ কার্যকর বিরোধী দল ছাড়া গণতন্ত্র হয় না। ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের মধ্য দিয়েও বিরোধী দল সরকারি দলের কর্মকান্ডের ওপর নজরদারি করতে পারে।

৪। স্বাধীন বিচার বিভাগ: বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন বিচার বিভাগের সত্যিকারের পৃথকীকরণ এবং আইনের শাসন কায়েম করা। এর জন্য প্রযোজন হবে আমাদের ধ্বংস প্রায় ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে কার্যকর করা। উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ ও অপসারণের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করা। আদালতকে, বিশেষত নিম্ন আদালতকে প্রভাবিত করার, রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা রুজুর ও রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা প্রত্যাহারের সংস্কৃতির অবসান করা।

৫। নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন: নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতার জন্য প্রয়োজন কমিশন গঠনের লক্ষ্যে সাংবিধানিক নির্দেশনা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন এবং তা যথাযথভাবে অনুসরণ করে স্বচ্ছতার সাথে সঠিক ব্যক্তিদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রদান। সকল নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশনকে প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা প্রদান ও আইনি কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা। জনপ্রশাসন থেকে নির্বাচন কমিশনে প্রেষণে নিয়োগের পরিবর্তে কমিশনের জন্য পৃথক ক্যাডার সৃষ্টি করা।

৬। সাংবিধানিক সংস্কার: সাংবিধানিক সংস্কারের লক্ষ্যে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা আবশ্যক। সংস্কারের ক্ষেত্রগুলো হতে পারে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য সৃষ্টি, সংসদে এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ ও সরাসরি নির্বাচন, ৭০ অনুচ্ছেদের সংস্কার, আদিবাসী তথা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান, গণভোটের বিধান পুনঃপ্রবর্তন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য একটি বড় আকারের 'ইলেক্টরাল কলেজ' গঠন, সংসদের উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠা, 'টার্ম লিমিটে'র বিধান প্রবর্তন ইত্যাদি।

৭। গণতান্ত্রিক ও স্বচ্ছ রাজনৈতিক দল: গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ এবং দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দল গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব নির্বাচন, প্রার্থী মনোনয়ন ও অর্থায়নে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা এবং পরিবারতান্ত্রিক সংস্কৃতির অবসান ঘটানো। রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে পরিবারতন্ত্র, উগ্রবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, পরিচয়ভিত্তিক বিদ্বেষ ও সহিংসতা পরিহার করার অঙ্গীকার নিশ্চিত করা। দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন বিলুপ্ত করা। একইসঙ্গে প্রয়োজন ফায়দাতন্ত্রের অবসান, যা ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য, যে কোনো শ্রেণি ও পেশার সাথে সম্পৃক্তরা লেজুড়বৃত্তির বাইরে এসে স্ব-স্ব স্বার্থ রক্ষা-সহ জনকল্যাণের নিমিত্তে অবশ্যই স্বাধীনভাবে সংগঠন করার অধিকার রাখে।

৮। স্বাধীন বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান: স্বাধীন বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজন সঠিক ব্যক্তিদের নিয়োগ ও যথাযথ আইনি সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনোক্রমেই যাতে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত ও দলীয়করণের শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করা।

৯। **দুর্নীতি বিরোধী সর্বাত্মক অভিযান:** দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রয়োজন বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠনের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা। সরকারের গৃহীত মেগা প্রকল্পে দুর্নীতি রোধে বিশেষ নজরদারিত্বের ব্যবস্থা করা এবং এসব মেগা দুর্নীতি দমনে দুদককে সক্রিয় করা। বিদেশে অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা এবং পাচারকৃত অর্থ ফেরৎ আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সাংবিধানিক অঙ্গীকার অনুযায়ী ন্যায়পাল নিয়োগ করা। উন্মুক্ত সরকার গড়ার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার প্রসারিত করা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

১০। যথাযথ প্রশাসনিক সংস্কার: যথাযথ প্রশাসনিক সংস্কারে প্রয়োজন একটি যুগোপযোগী *জনপ্রশাসন আইন* প্রণয়ন এবং মান্ধাতার আমলের *পুলিশ আইনের* সংস্কার করে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণসহ নিয়োগ বাণিজ্যের অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠানসমূহকে সত্যিকারের সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। সরকারি কর্ম-কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা। জনপ্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে দলীয়করণের প্রভাবমুক্ত করা। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়োগ ও বদলিতে লেনদেনের অবসান ঘটানো।

১১। বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার: বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজন একটি বলিষ্ঠ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের আলোকে আইন সংশোধন করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বাধীন ও কার্যকর করা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৫০ শতাংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যয় এবং উচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী স্থানীয় সরকারে সংসদ সদস্যদের ভূমিকার অবসান ঘটানো। স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে 'এসডিজি'র স্থানীয়করণ (localization) নিশ্চিত করা।

১২। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা: গণমাধ্যমের স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রয়োজন যথাযথ আইনি সংস্কার এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গণমাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের লক্ষ্যে যোগ্য ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি জাতীয় সম্প্রচার বোর্ড গঠন করা। গণমাধ্যমের ওপর সকল নিবর্তনমূলক বাধা নিষেধের অবসান ঘটানো।

১৩। শক্তিশালী নাগরিক সমাজ: একটি কার্যকর ও শক্তিশালী নাগরিক সমাজই রাষ্ট্রের সকল সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ওপর নজরদারিত্ব করার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে কার্যকর ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে পারে। তাই কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে, নাগরিক সমাজের কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

১৪। মানবাধিকার সংরক্ষণ: মানবাধিকার সংরক্ষণে প্রয়োজন মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সকল নিবর্তনমূলক ধারা সংশোধন করা এবং গুম, অপহরণ ও বিচারবহির্ভূত হত্যার অবসানের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সংস্কৃতির অবসান করা। পাশাপাশি সংবিধানে বর্ণিত অন্যান্য মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৫। একটি নতুন সামাজিক চুক্তি: রাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান আয় ও সুযোগের বৈষম্য নিরসনে একটি নতুন সামাজিক চুক্তি প্রণয়ন করা আবশ্যক। রাষ্ট্রীয় সম্পদে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর নায্য হিস্যা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন তাদেরকে ভর্তুকিসহ ঋণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা। তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণসহ তাদের শস্য ও স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আনা। একইসঙ্গে কৃষি পণ্যের নায্য মূল্য নিশ্চিত করা।

১৬। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা: জীব-বৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। একইসাথে প্রয়োজন সম্ভাব্য পরিবেশ বিধ্বংসী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পুনর্মূল্যায়ন করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ।

১৭। আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা: আর্থিক খাতে লুটপাট প্রতিরোধসহ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজন আইনি সংস্কার এবং ঋণখেলাপিসহ লুটপাটকারীদের পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে বিচারের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা। একইসাথে ব্যাংকিং খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা ও নিবিড় তদারকি নিশ্চিত করা।

১৮। তরুণদের জন্য বিনিয়োগ: জনসংখ্যাজনিত সুযোগ বা 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'কে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে প্রয়োজন তরুণদের জন্য আরও বিনিয়োগ করা। তাদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থসেবা, নিরাপত্তা নিশ্চিত ও সুযোগ সৃষ্টি করা। এসবের অভাবে তরুণরা বিপথগামী হলে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড 'ডেমোগ্রাফিক নাইটমেয়ারে' বা দুঃস্বপ্নে পরিণত হতে পারে। এলক্ষ্যে প্রয়োজন ছাত্র রাজনীতির নামে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিরাজমান নৈরাজ্যের অবসান করা।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের রাজনীতিতে চরম ভারসাম্যহীনতা এবং সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অতীতে অনেকবার আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে জাতিগতভাবে আমরা রাজনৈতিক সংকট সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ১৯৯০ সালে স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনকালে **'রাজনৈতিক দলসমূহের পারস্পরিক আচরণবিধি' (তিন জোটের রূপরেখা)** স্বাক্ষর ছিল এই ধরনের উদ্যোগের একটি সফল পরিণতি। তবে রূপরেখা স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে উদ্যোগটি সফল হলেও, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তা ছিল চরম ব্যর্থ; যে ব্যর্থতার দায়ভার আজও জাতিকে বহন করতে হচ্ছে, বার বার নিপতিত হতে হচ্ছে গভীর সংকটে। আমরা মনে করি, এই ধরনের সংকটের স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। আর এ জন্য চাই, তিন জোটের রূপরেখার আদলে একটি সমঝোতা স্মারক বা **জাতীয় সনদ** প্রণয়ন ও স্বাক্ষর। উপরিউক্ত সংস্কার ধারণাগুলি জাতীয় সনদের প্রাথমিক খসড়া হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আশা করি, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাববে এবং একটি জাতীয় সনদ প্রণয়ন ও স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

সুজন সচিবালয়: হেরালডিক হাইট্স, ২/২ (লেভেল-৪), মিরপুর রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭; facebook.com/shujan.bd